শিক্ষা তথ্য ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

C51

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

এই স্বস্তির আয়ু কতটুকু?

এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হতে চলেছে। পরীক্ষা শেষ হলে অভিভাবক স্বাস্তবোধ করবেন, একে এদেশে অন্তত কেউ হেঁয়ালি ভাববেন না। সন্তানের পরীক্ষা চালু থাকা আদতে অস্বাস্তর পর্যায়ও ছাড়িয়ে আছে। পরীক্ষা মানেই হাঙ্গামা, —পরীক্ষা মানেই বিস্তর গোলযোগ আর অনিশ্চয়তাজাত দুর্ভাবনা।

এবারকার পরীক্ষাও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। হাজারের হিসেবে পরীক্ষার্থী বহিস্কার ঘটেছে, গোলযোগ ভাংচুর প্রাণঘাতী পর্যায়ের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আর সব মিলিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যে ছবি ফুটে উঠেছে তার কোনো তুলনা আমার অন্তত জানা নেই। সমাজে ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের দায়িত্ব যাদের ওপর তাদেরও দেখা গেছে বিবেকের বালাই ঝেড়ে ফেলে সব বিচারে নিন্দিতদের কাতারে মিশে যেতে। ভয়াবহ এ পরিস্থিতি।

পরিস্থিতির ভয়াবহ রূপ দর্শন ঘটে আমার পরীক্ষা শুরুর আগেই। আটাশে মে ট্রেনে সিলেট যাচ্ছিলাম। সরাসরি ট্রেন। রাস্তায় কোথাও থামার কথা নয়। তবু সায়েস্তাগঞ্জে ট্রেন থেমে পড়লো। প্রথম মনে হয়েছিল হয়ত ক্রসিং-এর জন্যে এ বিরতি পরে দেখা গেল সেসব কিছুই না। ট্রেন থামেনি—থামানো হয়েছে। কখন ছাড়া হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ব্যাপারটা ছিল এই, সায়েস্তাগঞ্জে একটি কলেজ আছে। কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্রও ছিল। হঠাৎ করেই পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দেয়া হয়েছে, আর বিক্ষুব্ধ ছাত্রেরা তাই ট্রেন আটকে দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে।

পারাবত নামের এই দ্রুতগামী ট্রেনের শত শত যাত্রীর সঙ্গে আমাকেও পাঁচ ঘন্টা অসহায় বন্দীত্ব মেনে নিতে হয়। দুর্ভোগটা সবার সঙ্গে সমান ভাবে ভোগ করলেও আমি একটু বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছিলাম—ছাত্র আর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টা বুঝার চেষ্টা করেছিলাম। এতে করে একজন অভিভাবক হিসেবে আমার যন্ত্রণাই কেবল বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পরীক্ষা কেন্দ্র কখন আর কেন বাতিল হয়ে থাকে তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন একটা অবস্থায় আমাদের সন্তানেরা লজ্জিত হবে, অপমানে মাথা লুকোবে, এটাই আমার প্রত্যাশা। তা না করে ওরা যদি রেল লাইনের উপর চড়াও হওয়ার মত উদ্ধত হয়ে ওঠে বিব্রত আর শংকিত বোধ করার বেশি কিছু করার থাকে না।

পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে এমন কিংবা এর চেয়েও বাড়াবাড়ি অন্যত্রও ঘটছে। এতসবের পর পরীক্ষা শুরু হতেই দেখা গেল সাবধানতার কোন বেড়াই কাজে আসছে না। নকলবাজীর দাবীতে গলাবাজী থেকে শুরু করে সংঘটিত বলপ্রয়োগ আর ক্ষমতার সুযোগে ফায়দা হাসিলের মত কোন ঘৃণ্য তৎপরতাই বাদ পড়ছে না।

এ অবস্থায় অভিভাবক হিসেবে অস্বস্তি বোধ করা কোন ব্যাপারই না। আদতে ব্যাপারটাও তাই দাঁড়িয়েছে। অস্বস্তি ছাড়িয়ে আমরা এখন শংকা-তাড়িত। পরীক্ষা শেষ করে ছেলের ভালোয় ভালোয় ঘরে ফেরা নিয়ে সাময়িক স্বস্তিই কেবল পেতে পারি।

পরীক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যোগ প্রত্যক্ষ। পরীক্ষায় গোলযোগের দায় তাই প্রথমই ওদের উপরই বর্তায়। তবে সব দায়ই কি ওদেরই? নকল সরবরাহের জন্যে আমরা যারা হলের বাইরে ভিড় জমাই, জঙ্গীজোশে ঝাঁপিয়ে পড়ি কিংবা শিক্ষক থেকে শুরু করে আরও সব মর্যাদাজনক পেশার লোকেরা অসদুপায়ের সুযোগ করে দিতে তৎপর হয়ে উঠি তাদের স্থান কোথায় নির্ধারিত হবে?

উদাহরণ হিসাবে যদি সায়েস্তাগঞ্জের ঘটনাকেই গ্রহণ করি, ট্রেন আটকে দেয়ার মত চরম বেআইনী আর উচ্ছৃংখল আচরণের সবটুকু দায় কেবল শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দিতে আমি অন্তত রাজী নই। অনেক কিছুর যোগাযোগে এ ধরনের ব্যাপার ঘটে। কলেজের কর্তৃপক্ষ কি করেন? স্থানীয় প্রশাসকরা কেন আগেভাগে নজর দেন না। একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে কেমন করে ঢালাও নকল চলে? স্থানীয় মাতব্বররা পরীক্ষা কেন্দ্র থাকা-না থাকার সঙ্গে স্থানীয় মর্যাদাকেও জড়িয়ে ফেলেন। ফলে হৃত মর্যাদা ফিরে পাওয়ার উদ্যোগের পেছনে শিক্ষার্থীদের প্রকাশ্য তৎপরতার পেছনে পরোক্ষভাবে হলেও স্থানীয় মদত থাকে।

বিষয়টাকে যখন এভাবে দেখা হবে গলদের অবস্থান নির্ণয়ের উপায় থাকে না। আদতে নেইও। ছড়িয়ে ছিটিয়ে সে এমন তালগোল পাকিয়ে আছে যে সর্ব অঙ্গে দুষ্ট ক্ষতের বিস্তার—মলম মাখানোর কোন বিশেষ ঠাঁই আর নেই।

একই উদাহরণ থেকেই আরও একটি দিকের উপর আলো ফেলা যেতে পারে। পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করার মত কারণ সৃষ্টির কম করে এক বছর পর আরেকটি পরীক্ষা ফিরে আসে। সেই একটি বছর নিশ্চুপ থেকে পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে কেন্দ্র বাতিল করার মত ব্যবস্থা নেয়ার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? আগেভাগেই তো কাজটা করা যেত।

পরীক্ষা নিয়ে তাই যে অস্বস্তি শংকা আর দুর্ভাবনা যা ক্রমেই নৈরাজ্যের পর্যায় ছুঁতে যাচ্ছে এর উৎস ধরে দাওয়াই প্রয়োগের ব্যবস্থা না নিলে আজকের অস্বস্তি চরম হতাশায় গড়াবে। এখানে ওখানে মুষ্টিযোগের প্রয়োগ, তা পরীক্ষা পদ্ধতির হেরফের আর পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে টানাহেঁচড়া যাই হোক, কোনো ফল দিতে অক্ষম একথা জোর করেই বলা চলে।

ছেলে ভালোয় ভালোয় পরীক্ষা দিয়ে ফিরে আসার আজকের স্বস্তি পরের পর্যায়েও বজায় থাকবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। যদিও অভিভাবক হিসাবে এটুকু নিশ্চয়তা আমাদের পেতেই হবে। অন্যথায় আশা কিংবা আশ্বাসেরও কোন উপলক্ষ থাকে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাই যখন লক্ষ্য হিসাবে শিক্ষাকেও ছাড়িয়ে যায়, তখনই এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি সম্ভব হয়। আদতেও শিক্ষা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই সনদটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। আর তাতে করেই সকল বিপত্তি। ঠিক লক্ষ্যে ফিরে গিয়ে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার উপরই নির্ভর করছে শিক্ষার ভবিষ্যত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক সময় শিক্ষার সঙ্গে পানির ধারার উপমা টেনে ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল উপর থেকে ঠিকমত গড়িয়ে দিতে পারলেই শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব। পানি আর শিক্ষার ধর্মই গড়িয়ে যাওয়া এই ছিল তাঁর মত।

এ মতটাকে মেনে নিলেও বলতে হয়, গড়িয়ে যাওয়া পানির ধর্ম হলেও সবসময়ই যে গড়াতে পারবে এর নিশ্চয়তা নেই। সচল ধারাও হঠাৎ করে আটকা পড়ে যেতে পারে। আর পানির ধারা যখন গতি হারায় তখনই জন্ম নেয় বদ্ধ জলের পঙ্কিল আবর্জনা। আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক এ ব্যাপারটাই ঘটে বসে আছে? ধারাটা চলার ক্ষমতা হারিয়ে আবিলতাই বাড়িয়ে চলেছে। ক্রমবর্ধমান আবিলতার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় আর যাই হোক অবাক হওয়ার কারণ নেই।

একটি পরীক্ষার সফল সমাপ্তির পরও পরের পর্যায়ে ভর্তি থেকে শুরু করে আরো সব পরীক্ষা আছে। সন্তানের কল্যাণকামী পিতা মাতা কটি পরীক্ষা ন্যায়ের ধ্বজা সমুন্নত রেখে পাড়ি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন? অন্যায়ের কাছে কোথাও না কোথাও আমাদের মাথা নত করতেই হয়। এটাই আমাদের বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানেই সবার যন্ত্রণা। এই মাথা নত করার বাধ্য বাধকতা অপসারণের উপরই নির্ভর করছে সবার স্বস্তির স্থায়িত্ব। সমাজের কাছে এ কোন বড় চাওয়া নয়। আর এই চাওয়াটুকুর উপরই নির্ভর করছে গোটা সমাজের ভবিষ্যৎ এ কথাও এ সমাজকে উপলব্ধি করতে হবে।

মুষ্টিযোগের কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের তাই শিক্ষার অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠার পন্থা নিয়ে ভাবতে হবে।

—সালেহ চৌধুরী